بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ জুলাই, ২০২৫ মোতাবেক ১৮ ওয়াফা, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজও আমি মক্কা বিজয়ের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ঘটনাবলি বর্ণনা করব। মহানবী (সা.)-এর মক্কায় অবস্থানকালের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে এসেছেঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় আগমনের এবং মক্কা বিজয়ের পর মক্কায় কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন, তবে এই অবস্থানের মেয়াদকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন, অর্থাৎ কসর করতেন। আর কতক বর্ণনায় আঠারো বা সতেরো এবং পনেরো দিনের উল্লেখও রয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার উনিশ দিনের বর্ণনাকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মত দিয়েছেন, কারণ অধিকাংশ বর্ণনায় উনিশ দিনের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বাকি বর্ণনাগুলোকে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, উনিশ দিনের বর্ণনায় মক্কায় প্রবেশ ও রওয়ানা হবার দিনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যারা সতেরো দিনের কথা বলেছেন, তারা আগমন ও প্রস্থানের উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত করেন নি। যেসব বর্ণনাকারী আঠারো দিনের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তারা তার মধ্য থেকে একটি দিন গণনা করেছেন। আর পনেরো দিনের রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীরা সতেরো দিনের রেওয়ায়েত দৃষ্টিপটে রেখে লিখেছেন, এটিই হলো মূল, আর এরপর তা থেকে প্রবেশ ও প্রস্থানের দিন বাদ দিয়ে পনেরো দিনের উল্লেখ করেছেন।

কিছু প্রাচ্যবিদও মহানবী (সা.)-এর মক্কা বিজয় সম্পর্কে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উইলিয়াম মুইর একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ; তিনি স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তার গ্রন্থ The Life of Muhammad-এ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শের উল্লেখ করে লিখেছেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর অতীতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা, [অর্থাৎ (মক্কার) লোকদের সকল অপরাধ ক্ষমা করা] এবং তাদের দেওয়া সকল ছোটো-বড়ো কষ্ট ভুলে যাওয়া আসলে তাঁর (সা.) নিজের স্বার্থের জন্য ছিল। [এই কথা লেখার পর অবশ্য সত্যকে স্বীকার করতেও তিনি বাধ্য হয়েছেন।] তিনি বলেন, কিন্তু এর জন্য একটি বড়ো এবং কোমল হৃদয়ের প্রয়োজন। এতে যদিও তাঁরই সুবিধা হয়েছে যে, তাঁর পৈত্রিক শহরের সব মানুষ তাঁর সাথে যুক্ত হতে থাকে এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে একেবারে সানন্দচিত্তে এবং একান্ত নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করে নেয়। আর কয়েক সপ্তাহ পরই আমরা দেখতে পাই, তাদের মধ্য থেকে দুই হাজার ব্যক্তি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একান্ত বিশ্বস্ততার সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

একইভাবে উইলিয়াম মন্টগোমরিও লিখেছেন; তিনিও একজন স্কটিশ প্রাচ্যবিদ ছিলেন যিনি ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে তার গ্রন্থসমূহে অনেক কঠোর কথা বলেছেন। কিন্তু তার একটি গ্রন্থ রয়েছে– Muhammad at Medina। তাতে তিনি লিখেছেন; [আমি এর অনুবাদ পড়ছি, আগেরটিরও অনুবাদই পড়েছিলাম;] মক্কার নেতাদের মুসলমান হবার জন্য বাধ্য করা হয় নি। [একথা তিনি স্বীকার করছেন।] এই নেতারা এবং

অন্য অনেক মানুষ কুফরের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, যে দক্ষতার সাথে তিনি অর্থাৎ মহানবী (সা.) নিজ নেতৃত্বে বিদ্যমান বিশাল দলকে সামাল দিয়েছেন এবং প্রায় সকল ব্যক্তির মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের সাথে ন্যায়বিচার করা হচ্ছে– এই বিষয়টি ইসলামী সমাজে মতৈক্য, আস্থা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করেছে, যা অন্যান্য স্থানে বিদ্যমান অস্থিরতার বিপরীত ছিল। এই বিষয়টি নিশ্চয়ই অনেক মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে থাকবে এবং এটি তাদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-এর দিকে আকৃষ্ট করে থাকবে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি বিষয় অবশ্যই প্রভাবশালী এবং সেটি হলো, মুহাম্মদ (সা.)-এর নিজ লক্ষ্য, নিজ অন্তর্দৃষ্টি এবং নিজ দূরদর্শী প্রজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস। যখন তাঁর দল ছোটো ছিল এবং নিজেদের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যয় করছিল, তখন তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ আরবের ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন, যা বহির্মুখী উন্নতি লাভ করবে এবং যেখানে মক্কার লোকেরা তাদের পুরাতন বাণিজ্যিক ভূমিকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নতুন ভূমিকা পালন করবে। আর এখন প্রায় সবাই, এমনকি সবচেয়ে বড়ো ব্যক্তিরাও তাঁর সামনে মাথা নত করে নিয়েছিল। যথেষ্ট কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনোক্রমে, কিন্তু প্রায় সবসময়ই পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। যদি আমরা এসব ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতার বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হতাম, তাহলে খুব কম মানুষই একথা বিশ্বাস করত যে, মক্কার একজন নবী– যাকে নিতান্ত নগণ্য মনে করা হতো– তিনি নিজ শহরে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসতে পারেন।

আরেকজন প্রাচ্যবিদ হলেন আর্থার গিলম্যান; তিনিও একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ছিলেন। তিনি আমেরিকার বাসিন্দা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তার গ্রন্থ The Saracens-এ মহানবী (সা.)-এর সাধারণ ক্ষমা, উত্তম আদর্শ এবং সহনশীলতাকে অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরে লিখেছেন:

যখন মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সেই উটে আরোহণ করেই শহরে প্রবেশ করেন, যা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অন্য বহু উপলক্ষ্যেও তাঁকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল, তখন কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় ভরে ওঠে। কারণ তিনি রাস্তাগুলো খালি দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন, তাঁর অভ্যর্থনা শান্তিপূর্ণভাবে হবে। তাঁর এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রশংসনীয় যে, যে মুহূর্তে মক্কাবাসীদের অতীত অত্যাচারের স্মৃতি তাঁকে প্রতিশোধ গ্রহণে প্ররোচিত করতে পারত, (সেই সময়) তিনি তাঁর সৈন্যদের কোনো ধরনের রক্তপাত করতে নিষেধ করেন এবং বিনয় ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করেন। যেমনটি পূর্বে খালিদ বিন ওয়ালিদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেটির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বিষয়টি সত্য যে, একস্থানে খালিদ শক্তির মোকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) এতে তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এখানে মহানবী (সা.) প্রথম যে কাজটি করেছিলেন সেটি হলো, কা'বাকে মূর্তি থেকে পবিত্র করা এবং এরপর তিনি তাঁর মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দেন, কা'বার ওপর থেকে নামাযের জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানাও, আর একজন ঘোষণাকারীকে (ঘোষণা করতে) পাঠান যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাছে থাকা প্রতিমা ভেঙে ফেলে।

এরপর তিনি লেখেন, দশ বা বারোজন ব্যক্তি, যারা পূর্বে বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত বর্বর আচরণ প্রদর্শন করেছিল, তাদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাদের মাঝে চারজনকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই আচরণকে অন্যান্য বিজয়ীদের

আচরণের তুলনায় অনেক বেশি মানবিকতাপূর্ণ বলে অভিহিত করা উচিত; তিনি লেখেন, অর্থাৎ ক্রুসেডারদের (তথা খ্রিষ্টান ধর্মযোদ্ধাদের) অত্যাচারের তুলনায়, যারা ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাদের জেরুজালেম দখল করার সময়ে সত্তর হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও অসহায় শিশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল; অথবা ইংরেজ সৈন্যদের কঠোরতার তুলনায়, যারা ক্রুশের ছায়াতলেই যুদ্ধ করেছিল এবং যারা ১৮৭৪ সালের স্মরণীয় বছরে যুদ্ধকালে আফ্রিকায় গোল্ড কোস্টে বিদ্যমান একটি রাজধানী পুড়িয়ে দিয়েছিল। [গোল্ডকোস্ট ঘানার পুরাতন নাম।] মুহাম্মদ (সা.)-এর বিজয় প্রকৃতপক্ষে ধর্মের বিজয় ছিল, রাজনীতির নয়। তিনি সব ধরনের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাজকীয় আধিপত্যের সমস্ত পদ্ধতি থেকে বিরত থাকেন। আর যখন মক্কার সকল দাম্ভিক নেতাকে তাঁর (সা.) সামনে নিয়ে আসা হয়, তখন তিনি (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আজ আমার কাছে কীসের প্রত্যাশা রাখো? তারা বলে, হে আমাদের উদার ভাই, (আমরা) দয়ার প্রত্যাশা রাখি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে তা-ই হোক। যাও! তোমরা সবাই মুক্ত-স্বাধীন।

আরেকজন প্রাচ্যবিদ হলেন রুথ ক্র্যানস্টন (Ruth Cranston), তিনিও আমেরিকা নিবাসী ছিলেন। তিনি একজন নারী। মক্কা বিজয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তার পুস্তক World Faith-এ লেখেন, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে একদিন সেই ব্যক্তি, যাঁকে মাত্র দশ বছর পূর্বে ঐ শহর থেকে পাথর মেরে বহিষ্কার করা হয়েছিল আর যাঁকে উপহাসের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছিল– তিনি তাঁর দশ হাজার অভিজ্ঞ সৈন্যসহ আজ মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন। মুহাম্মদ (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাউকে যেন হত্যা করা না হয়, নগরবাসীদের সাথে যেন সদয় আচরণ করা হয়। কিন্তু মক্কাবাসীদেরকে সকল প্রকার প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তা প্রদান সত্ত্বেও তাঁর সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করা হয় এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য তাঁর সেনাপতি খালিদ (রা.), যিনি সে সময় বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন– তাকে কঠোর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

যাহোক, লেখক এক্ষেত্রে কিছুটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন। কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় নি, আর সে সময় মক্কাবাসীরাই প্রথমে আক্রমণ করেছিল। যাহোক, (অন্তরের) যে বিদ্বেষ তা কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ পেয়েই যায়। এরপর তিনি লেখেন, দুইজন মুসলমান এবং আটাশজন মক্কাবাসী নিহত হয়। এরূপ সময় এবং এরূপ পরিস্থিতিতে যদি অন্য কোনো নেতা সেনাপতির ভূমিকায় থাকতেন, তাহলে কল্পনা করুন– কী পরিমাণ রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ হতো! [এখানে (লেখক) প্রকৃত বিষয় তুলে ধরতে বাধ্য হন।] যখন মুসলমান বাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, তখন মুহাম্মদ (সা.) নিজের পোশাক পরিবর্তন করে সাদা এহরাম পরিধান করেন। তিনি (সা.) হজ্জের নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন। সাতবার কা'বা ঘর তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করেন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর অন্যান্য সাহাবীদের ডাকেন; সেসব সাথিকে, যারা বার বার নিজেদের জীবন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তাঁর (সা.) অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, যেন তারা এই মহিমান্বিত দিনে এবং তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর পাশে দণ্ডায়মান থাকেন। **হুবল**সহ ৩৬০টি পাথরের মূর্তি এক এক করে কা'বা গৃহ থেকে বের করা হয় এবং টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। প্রত্যেকটি মূর্তি ভাঙার সময় মুহাম্মদ (সা.) উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং (Karen Armstrong), তিনিও একজন খ্যাতিমান প্রাচ্যবিদ এবং সাধারণত খুবই নীতিবান লেখিকা ছিলেন। তিনি ১৯৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং লেখিকা; তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে লেখালেখির কারণে তার সুখ্যাতিও রয়েছে। তিনি তার Muhammad: A Biography of The Prophet পুস্তকে মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে লেখেন:

মহানবী (সা.)-এর রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধ নেবার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয় নি আর কারো প্রতি বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলেও মনে হয় না। মুহাম্মদ (সা.) লোকদেরকে বাধ্য করতে চান নি, বরং তাদের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি (সা.) কুরাইশকে অন্যায়-অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার জন্য মক্কায় আসেন নি, বরং সেই ধর্মকে নির্মূল করতে এসেছিলেন যা তাদের জন্য ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুয়্যতের দাবির সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। এই বিজয় কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়াই অর্জিত হয়েছিল এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর শান্তিপূর্ণ নীতি সফল হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই মক্কা থেকে মূর্তিপূজা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ইকরামা ও সুহায়েলের মতো ঘোর বিরোধীরাও নিষ্ঠাবান এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানে পরিণত হন।

যাহোক, তাদের মধ্য থেকে কতক প্রাচ্যবিদ এমন রয়েছেন, যারা চরম বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এই সত্য তুলে ধছেন আর এই বেচারারা এমনটি করতে বাধ্য ছিলেন; (তাদের) কিছুই করার ছিল না।

মক্কা বিজয়ের সাথে সম্পর্কিত আরো কিছু ঘটনা রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ্-র তওবার ঘটনা সম্পর্কে লিখিত আছে, সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কাতেবে ওহী বা ওহী-লেখক ছিল; এরপর সে মুরতাদ হয়ে ফেরত চলে যায়। বর্ণনা করা হয়, তাকেও মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর সে হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)-র বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। তিনি (রা.) তার দুধভাই ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আব্দুল্লাহ্‌র বয়আত গ্রহণ করুন। তিনি (সা.) বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করেন এবং অবশেষে তার বয়আত নেন। বর্ণনাকারী এখানে লেখেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্ যখন ফেরত চলে যায় তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, আমি এ কারণে কিছুক্ষণ নীরব ছিলাম যেন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ওঠে এবং তাকে দ্রুত হত্যা করে। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদেরকে ইশারা করলেন না কেন? এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, নবী হত্যার জন্য ইশারা করেন না। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এই বাক্য রয়েছে যে, নবীর জন্য তাঁর চোখের খিয়ানত করা সঙ্গত নয়। যাহোক, এই রেওয়ায়েত এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো কিছু রেওয়ায়েত বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে রয়েছে, তাই বর্ণনা করছি। কিন্তু এগুলো সব সংশয়পূর্ণ এবং মহানবী (সা.)-এর যে আদর্শ ও সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য ছিল তা প্রমাণ করে, এসব রেওয়ায়েত মনগড়া। যাহোক, হাদীসের একটি গ্রন্থ সুনানে নিসাঈ-তে এই রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের সময় আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ, হযরত উসমান (রা.)-র বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। পরবর্তীতে যখন সাধারণ বয়আতের ঘোষণা দেওয়া হয় তখন হযরত উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ্‌কে নিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, আব্দুল্লাহ্‌র বয়আত গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র মস্তক তুলে

তার দিকে তাকান আর তিনবার তিনি (সা.) এমনটি করেন এবং (বয়আত গ্রহণ করতে) অস্বীকৃতি জানান। আর তিনবার এমনটি করার পর তার বয়আত নেন। এরপর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো বিচক্ষণ লোক ছিল না– যখন দেখল যে, আমি বয়আত নিচ্ছি না– তখন উঠে তাকে হত্যা করত? সাহাবীগণ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কীভাবে জানব, আপনার হৃদয়ে কী আছে? আপনি আপনার চোখ দিয়ে আমাদের ইশারা করলেন না কেন? মহানবী (সা.) বলেন, কোনো নবীর জন্যই চোখের খিয়ানত করা সমীচীন নয়। এটি নিসাঈ-র রেওয়ায়েত, কিন্তু এক্ষেত্রেও এটিকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক নয়। এই রেওয়ায়েতটি সুনানে আবু দাউদেও আছে। অবশ্য সুনানে আবু দাউদে এটি ছাড়া অন্য একটি রেওয়ায়েতও রয়েছে, কিন্তু সেই রেওয়ায়েতে হত্যা ইত্যাদির উল্লেখ নেই। যেমন এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ্ মহানবী (সা.)-এর কাতেব (তথা ওহী-লেখক) ছিল। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে। সে কাফিরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলে মহানবী (সা.) তাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

এখানে আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ সম্পর্কিত এ ধরনের রেওয়ায়েতের বিষয়ে এটি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এই রেওয়ায়েত হাদীসের যেসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে (সেখানে) এর সনদের বিষয়ে আপত্তি করা হয়েছে যে, এটি সনদের মানদণ্ডে দুর্বল। [অর্থাৎ একথা বলা যে, ইশারা কেন করলেন না; মহানবী (সা.) বলেন, আমি নীরব ছিলাম ইত্যাদি। তিনি (সা.) বাদশাহ্ ছিলেন, প্রকাশ্যে বলতে পারতেন।] যাহোক, দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, ইসলামে মুরতাদ হবার বা ধর্মত্যাগের জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই। এজন্য আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ সম্পর্কে একথা বলা যে, সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাই তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছিল– এটি যথার্থ হতে পারে না। এছাড়া এটিও প্রণিধানযোগ্য বিষয়, এই ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, (তদনুসারে) এটি মহানবী (সা.)-এর মর্যাদারও পরিপন্থি বলে পরিদৃষ্ট হয়, যেমনটি আমি আগেই বলেছি। সেই দিন মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার গাফ্‌ফার, সাত্তার, রহীম ও করীম গুণাবলির পরিপূর্ণ প্রতিফলন ছিলেন। এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না, যে ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে ক্ষমা করেন নি, তা তার জন্য মৃত্যুদণ্ডই জারি করা হোক না কেন। আবার এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমেও নেই। উপরন্তু এই বর্ণনাটি বিশ্লেষণ ও যুক্তির আলোকেও ঠিক মনে হয় না। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.) একজন বিজয়ী নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। যদি সত্যিই কাউকে হত্যা করা আবশ্যক হতো, তবে কাউকে ভয় করার কী-ইবা প্রয়োজন ছিল, কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝানোরই বা কী দরকার ছিল? হযরত উসমান (রা.) যখন আব্দুল্লাহ্‌কে নিয়ে এলেন তখনই তিনি (সা.) স্পষ্ট বলে দিতে পারতেন, না! তার অপরাধ এত গুরুতর যে, তাকে ক্ষমা করা যাবে না। সেই দিনগুলোতেই বনু মাখযূমের জনৈক নারীর চুরির মামলাও মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয়; তার পক্ষে বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দিয়ে সুপারিশও করানো হয়েছিল; হযরত উম্মে সালামা এবং হযরত উসামা বিন যায়েদ এই সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি (সা.) কীভাবে সেই সকল সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে হাত কাটার শাস্তিই বলবৎ রাখেন! অতএব

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দের অপরাধ যদি এতই গুরুতর হতো তাহলে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হতো, তাকে ক্ষমা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না! অথচ এই ঘটনার পরিবর্তে মহানবী (সা.)-এর প্রতি এমন একটি কাজ আরোপ করা, যা সাধারণ নৈতিকতা ও শিষ্টাচারেরও পরিপন্থি– এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ সে যখন বয়আত গ্রহণের জন্য এলো তখন (নাউযুবিল্লাহ্) রসূলুল্লাহ্ (সা.) নীরব থাকলেন, যেন এরই ভেতর কেউ তাকে দ্রুত হত্যা করে ফেলে। আর সাহাবীরা যখন তাকে হত্যা করলেন না তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তারা তাকে হত্যা করলেন না? আর সাহাবীরা যখন বললেন, আপনি সামান্য চোখের ইশারা করলেই হতো; তখন তিনি (সা.) বলেন, নবীর চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করে না, এ কারণে চোখ দিয়ে ইশারা করেন নি। সেক্ষেত্রে (নাউযুবিল্লাহ্) এর অর্থ দাঁড়ায় বা তারা প্রমাণ করতে চায়, মহানবী (সা.)-এর মনের অভিপ্রায় ছিল, কেউ যদি তাকে হত্যা করে ফেলত তবে ভালো হতো, কিন্তু ইশারা করেন নি। এই রেওয়ায়েতের শব্দাবলিই ঘটনাটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে। মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা এমন কোনো বিষয় তাঁর প্রতি আরোপ করার চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে, অতি উচ্চ ও মহান। শরীয়ত বিষয়ক দণ্ডবিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি (সা.) পর্বতসম দৃঢ় ছিলেন এবং এক্ষেত্রে কারো কোনো পরোয়া করতেন না। অবশ্য ক্ষমা ও দয়া করার বেলায় তিনি (সা.) ছিলেন রেশমের ন্যায় নরম ও কোমল। তাঁর মনে কোনো ধরনের দুঃখ কিংবা সংকোচ থাকত না। তাই আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দের বয়আত সম্পর্কিত এ ধরনের বর্ণনা সন্দেহজনক এবং অনেক ঐতিহাসিক ও জীবনীকারও এসব বর্ণনাকে গ্রহণ করেন নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা আল-মুমিনূনের ১৫ নম্বর আয়াতের তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেছেন:

এই আয়াতের সাথে একটি ঐতিহাসিক ঘটনারও সম্পৃক্ততা রয়েছে, যা এখানে বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করছি। তিনি (রা.) লেখেন, মহানবী (সা.)-এর একজন ওহী-লেখক ছিলেন, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্। মহানবী (সা.)-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হলে তাকে ডেকে এনে তা লিখিয়ে নিতেন। একদিন তিনি (সা.) তাকে এই আয়াতগুলো লেখাচ্ছিলেন। যখন তিনি এ অংশে পৌঁছালেন ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ (অর্থাৎ এরপর সেটিকে আমরা এক নতুন সৃষ্টিরূপে বিকশিত করলাম) তখন তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়: فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ (অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত-না কল্যাণময়!)। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এটাই ওহী হয়েছে, এটা লিখে নাও। এই হতভাগা এটি চিন্তা করল না যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় স্বভাবতই এই আয়াতটি নিজে থেকেই চলে আসে। বরং সে ভাবল, যেভাবে আমার মুখ থেকে এই বাক্য উচ্চারিত হয়েছে আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) একে ওহী বলে আখ্যা দিয়েছেন, এভাবেই সম্ভবত তিনি (সা.) পুরো কুরআন নিজেই রচনা করছেন (নাউযুবিল্লাহ্)! ফলে সে ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে যায়। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্ও অন্যতম ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাকে আশ্রয় দেন এবং সে তিন দিন তাঁর ঘরে লুকিয়ে থাকে। একদিন যখন মহানবী (সা.) মক্কার লোকদের বয়আত গ্রহণ করছিলেন তখন হযরত উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্কেও তাঁর (সা.) কাছে নিয়ে আসেন এবং তার বয়আত গ্রহণের অনুরোধ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছুক্ষণ দ্বিধা প্রকাশ করলেও অবশেষে তার বয়আত গ্রহণ করেন এবং সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে।

আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি পরবর্তীতে সেসব সাহাবীর মধ্যে গণ্য হন যারা ইসলামের উল্লেখযোগ্য সেবা করেছেন। তিনি মিশরের গভর্নরও ছিলেন। আফ্রিকার একটি অঞ্চল জয় করেছেন। হযরত উসমান (রা.)-র শাহাদতের পর তিনি বিশৃঙ্খলা-নৈরাজ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, অথচ তিনি তাঁর (রা.) দুধভাই ছিলেন। আর কথিত আছে, তিনি এই দোয়া করেছিলেন যে, তার শেষ আমল যেন নামায হয়। বস্তুত একদিন তিনি ফজরের নামাযের জন্য দাঁড়ান এবং নামায শেষ করে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে বাম দিকে সালাম ফেরাতে যাচ্ছিলেন– তখনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৩৬ বা ৩৭ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর রয়েছে ইকরামা বিন আবু জাহলের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। ইকরামা বিন আবু জাহল সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইকরামা এবং তার পিতা মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত এবং তারা মুসলমানদের ওপর অনেক বেশি কঠোরতা প্রদর্শন করত। সে যখন জানতে পারে– রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেছেন, তখন সে ইয়েমেন অভিমুখে পলায়ন করে। ইসলামের শত্রুতায় সে তার পিতা আবু জাহলের চেয়েও অগ্রসর ছিল। আর এ-ও হতে পারে, তাকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এটিও একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে, মক্কার সেসব গোত্রপ্রধান ও নেতা যারা ইসলামের বিরোধিতায় সর্বাগ্রে ছিল এবং প্রতিনিয়ত ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়ুযন্ত্রে লিপ্ত থাকত, মক্কা বিজয়ের পর তারা নিজেরাই একথা চিন্তা করেছিল যে, তাদের এসব কর্মকাণ্ডের জন্য কোনোভাবেই তাদের ক্ষমা লাভ করা সম্ভব নয় এবং নিঃসন্দেহে তাদেরকে হত্যাই করা হবে। সুতরাং তারা একথা ভেবে নিজেরাই সেখান থেকে পালিয়ে যায়; আর তারা আসলে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সীমাহীন অনুগ্রহ, ক্ষমা ও মার্জনা লাভের কোনো আশাই করতে পারে নি, অধিকন্তু তাদের এ সম্পর্কে কোনো ধারণাও ছিল না। তাই তারা এটাই সমীচীন মনে করে যে, প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়াই উত্তম। কিন্তু যতই তারা মহানবী (সা.)-এর সীমাহীন ক্ষমা ও মার্জনা সম্বন্ধে অবগত হচ্ছিল, ততই তারা মক্কায় মহানবী (সা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ফিরে আসছিল এবং তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হচ্ছিল। যাহোক, ইকরামা সেসব নেতৃস্থানীয় বিরোধীদের অন্যতম ছিল যারা মক্কা বিজয়ের সময়ও ইসলামী সৈন্যদলকে বাধা দেবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। তারা নিজেদের সাথে কিছু লোকের একটি দল একত্রিত করে, যাদের মাঝে মক্কার কিছু সাহসী যুবক যেমন সুহায়েল বিন আমর, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তারা নিজেদের হাতে খোলা তরবারি নিয়ে ঘোষণা দেয়, আমরা কোনোভাবেই মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবো না। তারা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-র সৈন্যদলকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের বিশজনের অধিক যুবক নিহত হলে তাদের সবাই সেখান থেকে পলায়ন করে, আর সুহায়েল, সাফওয়ান ও ইকরামা– তিনজন মক্কা থেকেই পালিয়ে যায়। ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে ইকরামা সমুদ্রপথে ইয়েমেন চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেস বিন হিশাম, যে একজন কুরাইশ নেতার মেয়ে ছিল, সে হিন্দ বিনতে উতবা এবং মক্কার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে মক্কা বিজয়ের সময় একসাথে বয়আত করেছিল। সে যখন তার স্বামী ইকরামার মৃত্যুভয়ে ইয়েমেন অভিমুখে পালিয়ে যাবার বিষয়টি জানতে পারে, তখন সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, ইকরামার ভয় হলো, আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। আপনি

তাকে নিরাপত্তা প্রদান করুন। তখন হুযূর (সা.) বলেন, সে নিরাপদ। তখন সে নিজ ক্রীতদাসকে নিয়ে জেদ্দা অভিমুখে যাত্রা করে। সে ইকরামাকে সমুদ্রের তীরে এমন সময় দেখতে পায়, যখন সে জাহাজে আরোহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, সে ইকরামাকে তখন দেখতে পায় যখন সে জাহাজে আরোহণ করে বসেছিল। সে ইকরামাকে এই কথা বলে থামায়, হে আমার চাচাতো ভাই! আমি তোমার কাছে সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে এসেছি, যিনি লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সমঝোতা স্থাপনকারী, সবচেয়ে বেশি পুণ্যবান, সবচেয়ে বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী। তুমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না, কেননা আমি তোমার জন্য নিরাপত্তার আবেদন করেছি। এতে সে নিজ স্ত্রীর সাথে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে, আর তার ইসলাম গ্রহণ অত্যন্ত উত্তম সাব্যস্ত হয়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যখন ইকরামা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় তখন সে নিবেদন করে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার স্ত্রী আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। অর্থাৎ কুফরির অবস্থাতেও মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন; মুসলমান হবার শর্ত নেই। তিনি (সা.) বলেন, তুমি ঠিক বলেছ, নিঃসন্দেহে তুমি নিরাপদ রয়েছ। এতে ইকরামা বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ্ ব্যতিত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই; আর আপনি তাঁর বান্দা ও রসূল। সে লজ্জায় মাথা নীচু করে রেখেছিল। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে ইকরামা! আজকে তুমি আমার কাছ থেকে যা চাইবে, আমার সামর্থ্য থাকলে আমি অবশ্যই সেটি তোমাকে দেবো। ইকরামা নিবেদন করেন, আমি আপনার সাথে যে শত্রুতা প্রদর্শন করেছি– সেই প্রত্যেক শত্রুতার বিপরীতে আমার জন্য ক্ষমা লাভের দোয়া করুন। এতে মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার সাথে ইকরামার পক্ষ থেকে করা প্রত্যেক শত্রুতা ক্ষমা করে দাও, আর এমন প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়ও ক্ষমা করে দাও যা সে করেছে। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নিজের চাদর তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলেন, সেই ব্যক্তিকে স্বাগত, যে ঈমান এনে এবং হিজরত করে আমাদের কাছে এসেছে।

ইকরামার ঈমান আনার মাধ্যমে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবারও উল্লেখ পাওয়া যায়, যার উল্লেখ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) করেছেন। ইকরামার ঈমান আনয়নে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পায় যা বহু বছর পূর্বে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ সাহাবীদের বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন জান্নাতে রয়েছি। সেখানে আমি আঙুরের একটি থোকা দেখতে পেলাম আর লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার জন্য? কেউ উত্তরে বলল, আবু জাহলের জন্য। এই কথাটি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো আর আমি বললাম, জান্নাতে তো মুমিন ব্যতিত আর কেউ প্রবেশ করে না! তাহলে জান্নাতে আবু জাহলের জন্য আঙুর কীভাবে এলো? যখন ইকরামা ঈমান আনল তখন তিনি (সা.) বললেন, সেই থোকা আসলে ইকরামার জন্য ছিল। খোদা তা'লা পুত্রের স্থলে পিতার নাম প্রকাশ করেছেন, যেমনটি প্রায়শই স্বপ্নে হয়ে থাকে।

এরপর হাব্বার বিন আসওয়াদের পালিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়ে লেখা রয়েছে, সে অজ্ঞতার যুগে সুবক্তা ছিল এবং মানুষজনকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে একজোট করত। একইসাথে সে খুবই নোংরা স্বভাবের লোক ছিল। মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.) যখন মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। হাব্বার বিন আসওয়াদ তার উটটিকে ভয় পাইয়ে দেয়, যার ফলে তিনি উট থেকে

নীচে পড়ে যান। এর ফলে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায় আর একারণেই তিনি শেষ সময় পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, যেখানেই পাওয়া যাবে, তাকে যেন হত্যা করা হয়। মক্কা বিজয়ের সময় সে এই ভয়েই মক্কা থেকে পালিয়ে যায় আর বনেজঙ্গলে আত্মগোপনে থাকে। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) যখন মদীনায় ফিরে যান তখন সে সেখানে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়। সে যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় তখন সাহাবীরা তাকে দেখে ফেলেন আর মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হাব্বার আসছে। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। তাকে যেন কিছু বলা না হয়। হাব্বার কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে সমস্ত এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি। অনারবদের সাথেও আমি মিশতে চেয়েছি। পরবর্তীতে আমি আপনার দয়া ও কৃপা এবং পুণ্য ও মার্জনার কথা স্মরণ করি, যা আপনি সীমা লঙ্ঘনকারীদের সাথে করে থাকেন। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মুশরিক ছিলাম, আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন আর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমার কৃত অন্যায়-অত্যাচার এবং সেসব দুঃখকষ্ট মার্জনা করুন, যা আমার পক্ষ থেকে আপনি পেয়েছেন। আমি আমার মন্দ আচরণ ও পাপসমূহ স্বীকার করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেই সময় মহানবী (সা.)-কে দেখছিলাম। হাব্বারের ক্ষমাপ্রার্থনার দরুন তিনি (সা.) লজ্জা ও বিনয়ের কারণে মাথা নত করে বসে ছিলেন আর বলেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ইসলাম পূর্বের কৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, যাদেরকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, তাদের মাঝে সেই ব্যক্তিও ছিল, যার কারণে মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.)-র মৃত্যু হয়েছিল। সেই ব্যক্তির নাম ছিল হাব্বার। সে হযরত যয়নব (রা.)-র উটের জিন বাঁধার চওড়া রশি কেটে দিয়েছিল, যার ফলে হযরত যয়নব (রা.) উট থেকে নীচে পড়ে যান। এতে তাঁর (রা.) গর্ভপাত হয় এবং কিছুকাল পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি এই অপরাধও তাকে হত্যাযোগ্য করে তুলেছিল। এই ব্যক্তিও মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে ইরান অভিমুখে চলে গিয়েছিলাম। এরপর আমি চিন্তা করলাম, আল্লাহ্ তা'লা নিজের নবীর মাধ্যমে আমাদের শিরকের ধ্যানধারণা দূর করেছেন আর আমাদেরকে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। অন্যদের মাঝে না গিয়ে কেন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি না আর নিজের অপরাধসমূহ স্বীকার করে কেন তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি না? মহানবী (সা.) বলেন, হাব্বার! খোদা তা'লা যখন তোমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন, তখন আমি কেন তোমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করব না? যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। তোমার পূর্বের সব অপরাধ ইসলাম মুছে দিয়েছে।

তাকে তো ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথচ আব্দুল্লাহ্ সম্পর্কে বলা হয়, মহানবী (সা.)-এর কাছে (নাকি) নিবেদন করা হয়েছে, (তাকে হত্যার) ইশারা কেন করলেন না? (এর কোনো) আবশ্যকতাই ছিল না। যাহোক, আরেক ব্যক্তি ছিল কা'ব বিন যুহায়ের বিন আবি আসলামী। সপ্তম হিজরীতে কা'ব ও তার ভাই বুজায়ের উভয়ে 'আবরাক' নামক স্থানে আসে, যা বসরা থেকে মদীনাগামী পথের পাশে বনু আসাদ গোত্রের একটি কূপ। বুজায়ের সেখান

থেকে মদীনায় যায় আর সেখানে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এতে কা'ব খুবই অসন্তুষ্ট হয় আর ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করে। যদিও প্রচলিত রেওয়ায়েত থেকে এটিই মনে হয় যে, মহানবী (সা.) এই ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার কারণেই কা'বকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, আসল বিষয় শুধু এতটুকুই ছিল না, বরং কা'ব ও বুজায়ের মহানবী (সা.)-এর ক্ষতি সাধন বা হত্যা করার কোনো ষড়ুযন্ত্র করেছিল। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কা'ব মদীনা থেকে দূরে অবস্থান করে আর ভাইকে মদীনায় প্রেরণ করে। কিন্তু বুজায়ের ইসলাম গ্রহণ করে। কা'ব যখন ভাইয়ের ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদ পায় তখন সে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। এরপর যখন মহানবী (সা.) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন বুজায়ের নিজ ভাই কা'ব বিন যুহায়েরকে একটি পত্র লিখে অনুরোধ করে, সে-ও যেন তওবা করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; কেননা মহানবী (সা.) প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন, যে তওবা করে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়। অবশেষে কা'বের জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকল না। অতএব কা'ব একটি কাসীদা লিখল, সেই কাসীদার প্রথম চরণ হলো:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

অর্থাৎ সুয়াদ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর বিরহের যাতনায় আজ আমার হৃদয় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। (সুয়াদ তার প্রেমিকার নাম।)

এরপর কা'ব বিন যুহায়ের যাত্রা করে আর মদীনায় পৌঁছে পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী দিন সেই ব্যক্তি কা'বকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে এনে উপস্থিত করে। মহানবী (সা.) যখন ফজরের নামায শেষ করেন তখন সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর দিকে ইশারা করে কা'বকে বলেন, ইনি হলেন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। সে প্রথমে দাঁড়ায়, এরপর মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে বসে এবং মহানবী (সা.)-এর হাত ধরে ফেলে। মহানবী (সা.) এবং তাঁর আশপাশে থাকা সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কা'ব বিন যুহায়েরকে চিনতে পারেন নি। কা'ব নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কা'ব বিন যুহায়ের আপনার কাছে নিজের প্রাণভিক্ষার জন্য এবং তওবা করে মুসলমান হবার জন্য আসতে চায়। আমি তাকে যদি আপনার কাছে নিয়ে আসি, তাহলে আপনি কি তার তওবা গ্রহণ করবেন? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন কা'ব বলে, আমিই কা'ব বিন যুহায়ের। এ কথা শোনামাত্র একজন আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র এই শত্রুকে আমার হাতে তুলে দিন, আমি এর শিরশ্ছেদ করব। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও, সে তওবা করতে এবং অনুতাপ প্রকাশ করতে এসেছে। এরপর কা'ব যখন নিজের বিখ্যাত কাসীদা 'বানাত সুয়াদ' আবৃত্তি করতে করতে এই পঙ্‌ক্তিতে পৌঁছল:

إن الرسول لنورٌ يُستَضاءُ بِهِ

مُهنّدٌ من سيوفِ اللهِ مسلولُ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন অতুলনীয় এক নূর, যার মাধ্যমে সত্যের আলো লাভ হয়। আর তিনি আল্লাহ্‌র তরবারিগুলোর মাঝে এক ধারালো, উন্মুক্ত ভারতীয় তরবারি।' এটি শুনে মহানবী (সা.) নিজ শরীর থেকে চাদর খুলে কা'বের গায়ে জড়িয়ে দেন। উক্ত চাদরের কারণে এই কাসীদা 'কাসীদায়ে বুরদা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, অর্থাৎ চাদরের

কাসীদা। বুরদা অর্থ চাদর। একে 'কাসীদা বানাত সুয়াদ'ও বলা হয় আর 'কাসীদায়ে বুরদা'ও বলা হয়।

পরবর্তীতে কোনো এক সময় আমীর মুয়অবিয়া (রা.) উক্ত চাদর কা'বের কাছ থেকে অনেক বড়ো অংকের অর্থের বিনিময়ে কিনতে সচেষ্ট হন। কিন্তু কা'ব এ কথা বলে অস্বীকৃতি জানান যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই পবিত্র পরিধেয় কখনও হাতছাড়া হতে দেবো না। কিন্তু কা'ব (রা.) পরলোক গমন করলে হযরত আমীর মুয়াবিয়া কা'বের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে উক্ত চাদর ক্রয় করে নেন। এরপর এই চাদর বনু উমাইয়ার শাসকদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হতে থাকে আর তাদের রাজত্বের পতনের যুগে এটি হারিয়ে যায়। তারা লিখেছেন, জনসাধারণের মাঝে 'কাসীদায়ে বুরদা' নামে আরো একটি কাসীদা খুবই প্রসিদ্ধ। সেটি ইমাম শরফুদ্দীন বুসিরী কর্তৃক প্রণীত। এটিকেও কাসীদায়ে বুরদা বলার কারণ হলো, যখন তিনি মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এই কাসীদা রচনা করেছিলেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন, মহানবী (সা.) নিজের চাদর তাকে পরিয়ে দিয়েছেন যা ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পরও তার কাঁধে ছিল। কথিত আছে, ইমাম বুসিরী পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন আর এই চাদরের কল্যাণে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। যাহোক, এটি একটি কথিত গল্প যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে আর এমন গল্পও এসে থাকে। আরো কিছু চরম বিরুদ্ধবাদীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা রয়েছে এবং কীভাবে তারা ক্ষমা লাভ করেছে তা-ও রয়েছে। এগুলো পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

আগামী শুক্রবার থেকে (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা) আহমদীয়া জামা'ত যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন নিজ অনুগ্রহে এই জলসাকে বরকতমণ্ডিত করেন এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানকে স্বীয় আশিসরাজি দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত করেন। প্রত্যেক দুষ্ট ও অনিষ্টকারী ব্যক্তির বা কোনোরূপ ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণকারীর অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করুন। দেশের ভেতর থেকে বা বহির্বিশ্ব থেকে যে-সব অতিথি আসছেন– আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিরাপদে আনুন এবং এখানে সর্বদা স্বীয় নিরাপত্তায় সুরক্ষিত রাখুন। জলসার জন্য যাদের ব্যক্তিগত অতিথি অথবা জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে অতিথি আসছেন, অতিথিসেবা বিভাগের অধীনেই তাদের ব্যবস্থা করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অতিথিসেবককে তাদের আতিথেয়তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের সামর্থ্য দিন। কর্মীবৃন্দ, যারা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিজেদেরকে জলসার কাজের জন্য উপস্থাপন করে থাকেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে স্ব-স্ব বিভাগে সেবা করার সামর্থ্য দিন, আর তারা যেন অত্যন্ত সম্মান, মর্যাদা ও নম্রতা এবং আনন্দের সাথে অতিথিদের সেবা করতে পারেন।

কখনো কখনো অধিক কাজ এবং ঘুমের সল্পতার কারণে কতিপয় কর্মীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ মলিন হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক কর্মী, তা সে যে বিভাগেই দায়িত্বপ্রাপ্ত হোক না কেন, তার এই চেতনা নিয়ে দিনগুলো অতিবাহিত করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার সুযোগ ও সৌভাগ্য দিয়েছেন। তাই এই কাজের জন্য আমরা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের সেবার চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখব এবং কোনো প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ করব না, আর সর্বদা আমরা হাসিমুখে থাকব। তরুণ বয়সী মেয়েরা হোক বা মহিলারা হোন, অথবা যুবক ছেলেরা হোক বা বড়ো বয়সের পুরুষরা হোন; অফিসার হোন বা সহকারীই হোন, খাবার রান্না করার বা

লঙ্গরখানা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মী হোন বা খাবার পরিবেশনকারী হোন, নিরাপত্তাকর্মী হোন বা পার্কিংয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হোন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মী হোন বা (জলসাগাহের) ভেতরের ও বাইরের শৃঙ্খলায় নিয়োজিত কর্মী হোন, কিংবা প্রবেশপথের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মী হোন, শিশুদের মার্কিতে নিয়োজিত মেয়েরা হোক বা মূল জলসাগাহে দায়িত্বরত ছেলে-মেয়ে এবং নারী-পুরুষ কর্মীবৃন্দ হোন– সবারই সারাক্ষণ নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করা উচিত; আল্লাহ্ তা'লা এর সৌভাগ্য দিন। কিন্তু এর পাশাপাশি প্রত্যেকের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখাও জরুরি, যেন কোনো প্রকার অনিষ্ট করার দুঃসাহস কারো না হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মীকে উত্তমরূপে সেবা করার তৌফিক দিন এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিতে ভূষিত হোন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)